৭১ এর কোন একদিন

দিন আসে দিন যায় মাস পেরিয়ে আসে নতুন কোন বছর। আবার সে সবই জাগতিক নিয়মে বিলিন হয় মহা অতিতের গর্ভে। ধারাবাহিক সে সময়ের মধ্যে এমন কিছু ক্ষণ, সময় বা ঘটনা হৃদয়ে দাগ কেটে যায় যা কখনো ভুলে যাবার নয় বিস্তৃতি হবার নয়। সে স্মৃতিগুলো বার বারই হৃদয় পটে ভেসে ওঠে ধ্রুপদী চলচিত্রের মতো। এমনই একটি শৈশব স্মৃতি যা আমাকে কখনো হাসায় আবার কখনো বা গভীর বেদনায় কাঁদিয়ে যায়। অনেক চেষ্টা করেও জীবনের পাতা থেকে বাদ দিতে পারিনি সেই স্মৃতি।

মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলায় সীমান্তবর্তী একটি গ্রামে আমার জন্ম। শৈশব এর কথা মনে পড়তে স্মৃতিপটে ভেসে আসে বাড়ির উঠোনে চাঁদের আলোয় দাদির পাশে বসে গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তাম। কিন্তু হঠাৎ করেই জীবন থেকে মিলিয়ে গিয়েছিলো সেইসব মধুর সময়। কিছুদিন থেকেই গ্রামের মানুষের মুখে মুখে শুনছিলাম যে কোন সময় গ্রামে মিলটারি আসতে পারে। দুদিন হলো মেহেরপুর শহরের প¦◌ার্শবর্তী গ্রাম গোভীপুর থেকে ফুফুদের বাড়ির সবাই আমাদের বাড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছে। আমার এক চাচা আনসার বাহিনীর সদস্য ছিলেন তিনি তার চাকুরি ছেড়ে চলে এসেছেন। আমাদের সতর্ক করে বললেন এখানে থাকা আর নিরাপদ হবে না প্রয়োজনে ভারতে চলে যেতে হবে। আমি লক্ষ করছিলাম দেশের ভিতর থেকে অনেক মানুষ পায়ে একেবারে হেটে ভারতে পালানোর নিমিত্তে গ্রামের পথ ধরে সীমান্তের দিকে এগিয়ে চলেছে। তাদের কষ্ট দেখে আমার কান্না পাচ্ছিলো।

দিনটি আমার ঠিক ঠিক মনে পড়ে না তবে ২৫ অথবা ২৬ মার্চ ১৯৭১ হঠাৎ করেই পাকিস্তানি মিলিটারিদের একটি হেলিকপ্টার এই এলাকার আকাশে ঘুরে ঘুরে উড়ে চলছিলো। এতখানি নিচু দিয়ে হেলিকপ্টার চলা জীবনে আমার প্রথম দেখা। দ্রুত আতংকে গ্রামের সর্ব সাধারন পালাতে লাগলো। পার্শবর্তী মাঠের দিকে কোন নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। বিশেষ করে মেয়েদের সরিয়ে নেওয়া হচ্ছিলো। শোনা গিয়েছিলো পাকিস্তানি মিলিটারিরা মেয়েদের সম্মানহানিসহ যেকোন অত্যাচার করতে দ্বিধা করে না। ঠিক ঐ সময় আমি পাশেই নদীতে গোসল করতে গিয়েছিলাম। এসেই দেখি আমাদের বাড়ির কেউ নেই শুধু আমার বাবা আমার জন্য অপেক্ষা করছিলো। আমাকে পাবার পর আমাকে সাথে নিয়ে দৌড়াতে লাগলো। পরক্ষনেই তথাকথিত মিলিটারি নামক পাক হানাদার বাহিনী দাপটে প্রবেশ করেছিলো গ্রামে। অস্ত্র হাতে তারা নিরীহ জনগনের ওপর চালিয়ে ছিলো অত্যাচার। মহুর্তে যারা ঘর থেকে পালাতে পারেনি

এমন মেয়েদের ওপর তারা চািিলেছলো পাশবিক নির্যাতন।

মনে পড়ে সেদিনই বাড়ি থেকে আমরা রওনা হয়েছিলাম প¦◌ার্শবর্তী দেশ ভারতের উদ্দেশ্যে। বাড়ি থেকে একটি গরুর গাড়িতে নিত্যপ্রয়োজনীয় কিছু দ্রব্য চাপিয়ে দিয়ে দূর্দাশাগ্রস্ত কাঁচা ও কর্দমাক্ত রাস্তা পায়ে হেটে হেটে অতিক্রম করে কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে আগত সন্ধ্যার আধারে পৌছালাম একেবারে সীমান্ত রেখার সন্নিকটে বাজিতপুর নামক গ্রামে। যে গ্রামটি আমার জীবনের অচেনা এক জগৎ ছিলো। সেই রাতের অচেনা অন্ধকারে সেই গ্রামের রুপ বর্ণনা করা আমার আর সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এমনকি আজ জীবনের এই সন্ধিক্ষনে এসেও বহুবার চেষ্টা করেও পারিনি মিল করতে। শুধু মনে পড়ে আমার বাবার দুর সম্পর্কের কোন আত্মিয়ের বাড়িতে উঠেছিলাম। তাদের বাড়ির স্বল্পপরিসরে যারপরনায় আন্তরিকতার সাথে তারা ঠায় করে দিয়েছিলো ক্লান্ত অবসাদ মাখা মানুষগুলোকে একটি রাত্রি যাপনের জন্য। আমার ফুপাদের পরিবারসহ আমাদের পরিবারের লোকজন এবং যথারিতি তাদের পরিজন মিলে এক নঙর খানার মতো সৃষ্টি হয়েছিলো সে রাতে।

শেষাবধি আমি এবং আমার এক ফুপাতো ভাই গরুর গাড়ির নিচে বিচালী বিছিয়ে শয়ন করেছিলাম, কিন্তু বিধিবাম দৈবাৎ শুরু হলো প্রকৃতির পাগলামি আকাশ জুড়ে মেঘ, শুরু হলো বৃষ্টি ঘুম ভেঙ্গে গেলো। আমাদের পাশেই ছিলো অপরিচ্ছন্ন খুঁদে একটি রান্না ঘর। আমার ফুপাতো ভাইটি আমার তুলনায় বয়সে বড় ছিলো সে কারনে বুদ্ধিও তার আমার চেয়ে বেশি থাকার কথা। তারই নির্দেশনায় শেষমেষ ঐ রান্নাঘর নামক জায়গাটিতে ঢুকে পড়লাম। কিন্তু সেখানে ছিলো একটি কুকুর শুয়ে। মনে হলো আজন্ম ঐ জায়গাটি তারই। আমার ফুপাতো ভাইয়ের অত্যাধিক প্রচেষ্টায় কুকুরটিকে অপসারিত করা গিয়েছিলো জায়গা হতে। আমরা ও আমাদের অবসাদক্লিষ্ট শরীরটা এলিয়ে দিয়েছিলাম সেখানে। আবারো চোখের পাতায় ভর করেছিলো ঘুম। সকালে নিদ্রা ভঙ্গ হলে দেখি কুকুরটা আমাদের পাশেই শুয়েছিলো।

লেখক: কবি ও সাহিত্যিক

মানবমুক্তির সংগ্রামে লালন ও ভাসানী

ভূ-ভারতের অধিকাংশ মানুষ আসলে তাড়া-খাওয়া মানুষ। যুগে যুগে তাদের তাড়া করেছে দেশি-বিদেশি শাসক-শোষক এবং রঙ বেরঙের বিভাষী- বিধর্মীরা। সময় কখনও তাদের অনুকূলে ছিল না, এখনও নেই। উনিশ কিংবা বিশ শতকেও তাদের নিগৃহীত-উৎপীড়িত, রক্তাক্ত, ক্ষত-বিক্ষত হতে হয়েছে। এখনও অবস্থা থৈবচ। আমাদের পূর্বপুরুষরা প্রবল স্রোতের বিপরীতে সাঁতরে সাঁতরে কূলে ভিড়তে চেয়েছিলেন। কেউ কেউ খানিকটা সফল হলেও অধিকাংশরা একেবারেই হননি। কারো জন্য বিপরীত স্রোতটা এত তীব্র ছিল যে তা উতরানো সম্ভব হয়নি। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতা সব সময় আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। অদৃষ্টের পরিহাসে যারা এই ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন এবং ইতিহাস বদলাবার লড়াইয়ে অংশ নিয়েছেন, তাদের সবাইকেই তাড়া খেতে হয়েছে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, জিন্নাহ, নেহেরুর মতো লালন, কাঙাল হরিনাথ, নজরুল, ভাসানী, শেরে বাংলা, শেখ মুজিবকেও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গোলকধাঁধাঁর ফ্যারে পড়ে তাড়া খেয়ে ফিরতে হয়েছে। ফকির লালন ছিলেন সর্বোতভাবে একজন তাড়া-খাওয়া মানুষ। ধর্মধ্বজি বজ্জাতদের তাড়া খেয়ে তাকে বেছে নিতে হয়েছিল আড়ালটানা মগ্ন সাধকের ব্যতিক্রমী জীবন।

ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সময় তিনি যদি বেঁচে থাকতেন, তাহলে গান লেখার অপরাধে তাঁকে হয়তো জেলে যেতে হত, যেমন নজরুলকে যেতে হয়েছিল। সাতচল্লিশে দেশভাগের সময় বেঁচে থাকলে তিনি কুষ্টিয়ার কুমারখালিতে থাকতে পারতেন না, উদ্বাস্তু হয়ে পশ্চিমবঙ্গে পাড়ি জমাতে হত। তফসিলি-দলিত সম্প্রদায়ের নেতা যোগেন মণ্ডলকে পাকিস্তান ছাড়তে হয়েছিল। নাচোলের তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী ইলা মিত্র পূর্ববঙ্গে থাকতে পারেননি, রাষ্ট্রনৈতিক কারণে লালনও হয়তো থাকতে পারতেন না। পাকিস্তানের কায়েমি স্বার্থবাদী সমাজ তাঁকে মেনে নিত না। কারণ তাঁর গানে-জীবনাচরণে, আদব-কায়দায় হিন্দুয়ানির ছাপ ছিল। তিনি গৌরাঙ্গ, নিতাই, অদ্বৈত ঠাকুরকে নিয়ে গান বেঁধেছেন। তিনি শরা-শরিয়ত মানতেন না, শিরক-বেদাত সমর্থন করতেন। এখন প্রশ্ন, বিশ শতকের গোড়ায় কিংবা তারও দু দশক আগে জন্মগ্রহণ করে বিশ শতকের আশির দশক পর্যন্ত লালন যদি বেঁচে থাকতেন, তাহলে তিনি কার মতো হতেন? এর উত্তর হতে পারে, তিনি মওলানা ভাসানীর

মতো হতেন অথবা নজরুলের মতো। তবে কমরেড মোজাফফর আহমেদ কিংবা মনি সিং হতে পারতেন না, কারণ এরা ছিলেন মার্কসবাদী কমিউনিস্ট। এদের সহযাত্রীরা ছিলেন লেখাপড়া জানা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত।

দ্বিধাহীনভাবেই বলা যায়, ফকির লালন ছিলেন উনিশ শতকের পোড়-খাওয়া, লড়াকু মানুষ। মজলুম জননেতা ভাসানীর মতো লালনের লড়াই ছিল জমিদারতন্ত্র, নীলকর সাহেব, ধন-বৈষম্য, জাতপাত, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ও শোষণ-বঞ্চণার বিরুদ্ধে। লালন ও ভাসানী দুজনেই ছিলেন সাদামাটা মানুষ। আচার-আচরণ, চাল-চলন, বেশভূষা, মুখের ভাষা সবদিক দিয়েই তাঁরা ছিলেন একেবারে সাধারণ মানুষ। যে-পারিবারিক পরিমণ্ডলে তাঁরা জন্মেছিলেন, তাতে ওই রকম সাদামাটা, সরল-সহজ হওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক। বরং না-হওয়াই ছিল অস্বাভাবিক। সিরাজগঞ্জের ধানগড়া গ্রামের এক কৃষক পরিবারে ভাসানীর জন্ম। শৈশবে বাবা-মাকে হারিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার পর্ব চুকে যায়। যে-বালক খুব অল্প বয়সে পিতৃমাতৃহীন অনাথ হয়, তিনি বড় হয়ে গভর্নর-মুখ্যমন্ত্রী-মন্ত্রী হবেন এমনটা আশা করা যায়! যায় না। ভাসানীও তেমন কিছু হননি বা হবার সুযোগ থাকলেও হতে চাননি। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে নেতৃত্বদানকারী ভূমিকা পালন করলেও মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেননি। ভাসানীর মতো লালনেরও কেউ ছিল না, বড় অসহায়, বড় নিঃসঙ্গ ছিলেন তিনি। তাঁর জীবনের গল্পটা ছিল খুবই সাদামাটা, খুবই আটপৌরে। সেই গল্পের ভেতর কোনো জৌলুশ বা চাকচিক্য খুঁজে পাওয়া যায় না। তারপরও তিনি আমাদের লোকায়ত ইতিহাসের এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। লালন এবং ভাসানী অতি সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও দুজনেই অনেক বড়মাপের মানুষ হয়েছিলেন। অসাধারণ রকমের বড়মাপের মানুষ হয়েও আত্মম্ভরিতা, অহমিকা কিংবা উচ্চমন্যতায় ভোগেননি। আমৃত্যু মিশে থেকেছেন দীনহীন, নিঃস্ব, রিক্ত মানুষের সঙ্গে।

লালনের কালে কোনো দলীয় রাজনীতি ছিল না। তাঁর জীবৎকালে অক্টাভিয়ান হিউমের পৃষ্ঠপোষকতায় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হলেও এর শাখা-প্রশাখা তখনও গ্রাম-গঞ্জে বিস্তৃত হয়নি। রাজনীতি থাকলে তিনি হয়তো রাজনীতিতে হতেন। ইতিহাসকে বদলাতে চাইতেন—চাইতেন স্বাধীনতা ও মুক্তি। চাইতেন স্বশাসিত শৃঙ্খলমুক্ত স্বাধীন সমাজ। তিনিও ক্ষমতা চাইতেন আর পাঁচজন সংগ্রামী-জননায়কের মতো। কিন্তু সেটা ব্যক্তি বা গোষ্ঠীগত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য নয়। ক্ষমতা চাইতেন জাতপাত, শোষণ-বঞ্চণার অবসান ও সর্বজনের কল্যাণের জন্য। ক্ষমতা চাইতেন ধর্মের নামে মানুষ ঠকানোর ব্যবসা রুখে দেওয়ার জন্য। মানুষকে গভীরভাবে ভালবাসতেন বলেই তিনি রাজনীতি করতেন,

সেখানে ব্যক্তিগত লাভ-লোকসান প্রাধান্য পেত না। অন্যায়-অবিচার, বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতেন। প্রতিতুলনা না-করেও বলা যায়, লালন ও ভাসানী দুজনেই ছিলেন সর্বতোভাবে প্রতিবাদী ও বিদ্রোহী জননায়ক। লালনের লড়াই ছিল প্রচলিত সমাজের অন্ধ অনুশাসনের বিরুদ্ধে, বিদ্যাসাগরও লড়াই করেছেন। লালনের সমকালীন রাজা রামমোহনও সমাজ বদলের জন্য লড়াই করেছেন, তবে তা ছিল কলকাতা মহানগরের মধ্যেই পরিসীমিত। তাঁর লড়াইয়ের সহযোদ্ধারা ছিলেন কলকাতার সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষিত এলিটরা। ভাসানীর মতো মুজিবও লড়েছেন রাষ্ট্রযন্ত্র ও আধ্যিপত্যবাদী শক্তির নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে। মওলানা ভাসানী রাজনীতি করেছেন সমাজতান্ত্রিক ধারায় শোষণ-জুলুমের বিরুদ্ধে, আর মুজিবের রাজনীতি ছিল উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ধারায় কল্যাণমূলক ইনসাফভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য। একাত্তরে দুজনেই ছিলেন দেশদ্রোহী।

মুজিব ছিলেন সবচেয়ে বড় রাষ্ট্রদ্রোহী, রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে পাকিস্তানিরা তাঁকে হত্যা না করলেও স্বাধীন দেশে তিনি নিহত হয়েছেন। ভাসানী প্রতিপক্ষের হাতে নিহত হননি, কিন্তু বারবার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। কলঙ্ক-অপবাদ নিতে হয়েছে। আসলে রাষ্ট্র কোন বিমূর্ত ধারণা নয়; কিংবা ধূলির ধরণীতে ঈশ্বরের জয়যাত্রাও নয়। এটা ক্ষমতাধর ও শক্তিমানদের স্বার্থরক্ষারী বৃহৎ মানবীয়-প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রের মতো প্রচলিত সমাজও প্রাধান্যশালী শ্রেণি বা গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষার কাজে লিপ্ত থাকে। ‘সমাজ’ চায় ধর্মের অনুশাসন, সংস্কার, প্রথা-পার্বণ, জাতপাতের দোহাই দিয়ে দুর্বলের উপর নিপীড়নের স্টিমরোলার চালিয়ে যেতে। রাষ্ট্র বা সমাজের কর্তারা বেশ নিষ্ঠুর ও নির্মম। তারা খুন-খারাবি, চুরি-ডাকাতি, লুণ্ঠন-ধর্ষণ সহ্য করে, কিন্তু রাষ্ট্র ও সমাজের প্রথা, বিধি-বিধান ও অনুশাসনের বিরুদ্ধাচারণকারীকে ক্ষমা করে না। এ কারণে লালন, ভাসানী, মুজিবকে রাষ্ট্রযন্ত্র ও প্রচলিত সমাজব্যবস্থা ক্ষমা করেনি। একাত্তরে ওসমানি, জিয়া, তাহেররাও দেশদ্রোহী ছিলেন, পাকিস্তান টিকে থাকলে তারাও ক্ষমা পেতেন না।

বিরূপ পরিবেশে বসবাস করেও লালন ও ভাসানী স্বপ্ন দেখেছেন এবং মানুষকে স্বপ্ন দেখিয়েছেন। লালনকে চলতে হয়েছে প্রতিহিংসাপরায়ণ, জাতপাত-কবলিত প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে, আর ভাসানীকে রাজনীতি করতে হয়েছে রাষ্ট্রশক্তির হুমকি-ধামকি আর পরোয়ানার বিরুদ্ধে লড়াই করে। রাজনৈতিক বাস্তবতাকে অস্বীকার করে তিনি অরবিন্দের মতো সিদ্ধপুরুষের জীবন বেছে নেননি। তাঁর রাজনীতি,

লড়াই-সংগ্রাম আর অধ্যাত্মচর্চা ছিল একইসূত্রে গাঁথা। লালনের অধ্যাত্মচর্চার মধ্যেও সমাজবিচ্ছিন্নতা ছিল না। তিনিও সমাজে মানুষের ওপর মানুষের নিপীড়নের অবসান চেয়ে লড়াই করেছেন।

লালনের সমকালে অবিভক্ত বঙ্গদেশের অধিকাংশ মানুষ ছিলেন প্রান্তিক কৃষক ও রায়ত। তাদের ওপর জমিদার ও সুদখোর মহাজনদের অত্যাচার ছিল। কৃষকদের শত্রু যে জমিদার, মহাজন ও নীলকর সাহেবরা কেমন তা তিনি নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি ছিলেন জমিদার ও নীলকরবিরোধী। ঠাকুর এস্টেটের জমিদারদের বিরুদ্ধে কাঙাল হরিনাথের সাথে একজোট হয়ে তিনি ও তাঁর শিষ্যরা লড়াই করেছেন। নিঃস্ব রিক্ত, দীনহীন মানুষের কাছাকাছি থেকে তিনি বুঝেছেন যে, গরিব মানুষের শত্রু কেবল বিদেশী বণিক আর রাজপুরুষরাই নন, ইংরেজদের অনুকম্পাপ্রাপ্ত দেশি জমিদার-মহাজন ও মধ্যস্বত্বভোগী বাবুরাও তাদের শত্রু।

ব্রিটিশ আমলে বঙ্গদেশ ছিল সাতসমুদ্র পারের সাদাচামড়ার রাজপুরুষদের অধীনে, তাদের সহযোগীরা ছিল দেশি জমিদার, সুদখোর মহাজন, মোল্লা-পুরুত আর রক্তচোষা চাঁড়াল নীলকর সাহেবরা। এজন্য লালন একই সঙ্গে ছিলেন সামন্তবাদ, নীলকর ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী। ছিলেন সম্প্রদায়-ঊর্ধ্ব অখণ্ডদৃষ্টিসম্পন্ন ধর্মনিরপেক্ষ-মানুষ। কোনো সম্প্রদায়-গোত্র, মাজহাব বা মোকামের ঘেরটোপে নিজেকে আটকে রাখতে চাননি। ধর্মের নামে, সম্প্রদায়ের নামে সমাজটা খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যাক, এটা তিনি চাননি। অন্যায়-অবিচার, শোষণ-বঞ্চণার অবসানে হিন্দু-মুসলমানকে তিনি এক শামিয়ানার নিচে এনে পঙক্তি ভোজন করিয়েছেন। ভেদবুদ্ধিমুক্ত শোষণহীন সমাজ কায়েম করাই ছিল তার আরাধ্য। তিনি বলেছেন: ‘এমন সমাজ কবে গো সৃজন হবে,/ যেদিন হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান জাতিগোত্র নাহি রবে।’ গানের মাধ্যমে তিনি আসলে জাতিগোত্রহীন, সমতাভিত্তিক সমাজের ভাবকল্পই সারা জীবন প্রচার করে গেছেন। শোকে-সুখে, হর্ষ-বিষাদে বাংলার কৃষকসমাজ যেমন শিরদাঁড়া টানটান করে মাটিলগ্ন হয়ে থাকে, লালনও তেমনই নিজের মাটি ও মানুষকে ছেড়ে আকাশবিহারী হতে চাননি। লালনের মতো মওলানা ভাসানীও ছিলেন মৃত্তিকালগ্ন সংগ্রামী পুরুষ। দীন-দরিদ্র মানুষকে ভালবেসে কৃষক সমাজকে নিয়ে সারাজীবন পরাক্রান্ত প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। বক্তৃতামঞ্চ থেকে জালিম ও জুলুমের বিরুদ্ধে মজলুম হয়ে আগুন ঝরিয়েছেন। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থান সফর করেছেন, কিন্তু সর্বত্রই তিনি তার প্রতিবাদী-কৃপাণ শাণিত করেছেন জুলুমবাজদের বিরুদ্ধে। ছিলেন অগ্রসর চিন্তার মানুষ,

অনিবার্য পরিস্থিতির কারণে দল ভেঙেছেন, নতুন দল ‘ন্যাপ’ গড়েছেন, তবে লক্ষ্যভ্রষ্ট হননি কখনোই। লালনও ছিলেন তাই, তিনিও চেয়েছেন মানবমুক্তির নহবত শুনিয়ে সমাজের ভেদাভেদ ঘোঁচাতে।

লালন ও ভাসানী দু জনেই ছিলেন অধ্যত্মসাধক। একজন লোকায়ত ধারার মরমি ফকির, আরেকজন ইসলামি-সুফি প্রবর্তনার পির। দু জনই এসেছিলেন ধর্মীয় পরিমণ্ডল থেকে, লালনের শিক্ষা আউল-বাউল-সাঁই-দরবেশ তথা লোকায়ত অধ্যাত্মসাধকদের কাছ থেকে। ভাসানীর শিক্ষা মাদ্রাসা- মক্তব ও কামেল পির-মুর্শিদদের কাছে। লালনের ছিল শত শত শিষ্য-চ্যালা, যারা অধিকাংশই অর্থনৈতিকভাবে নিঃস্ব-রিক্ত, সামাজিকভাবে অপাঙক্তেয়। ভাসানীরও ছিল লক্ষ লক্ষ মুরিদ, তাদের অধিকাংশই ছিল শোষিত-বঞ্চিত-ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষ। দুজনেই অধ্যাত্মসাধক হিসেবে ভূমিকা পালন করেছেন, কিন্তু লড়াইয়ের ময়দান থেকে চুল পরিমাণ পিছু হটেননি। হাল আমলে বেঁচে থাকলে, ফকির লালনও পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী লড়াইয়ে সামনের কাতারের সেনানী হিসেবে সামিল হতেন। তিনিও শোষণহীন-মানবিক সমাজ কায়েমের লড়াইয়ে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট কিংবা র্যাডিক্যাল বামপন্থীদের সহগামী হতেন। ভাসানীর মতো হয়তো-বা তাকেও জেলে যেতে হত কিংবা জেলে বসে অনশন-ধর্মঘট করতে হত।

লালন বেঁচে থাকলে জিন্নাহ-গান্ধীর ধারার রাজনীতি করতেন না বা করতে পারতেন না। তাঁর পূর্বসূরি হতেন সুভাষ বসু যিনি ছিলেন মনেপ্রাণে অসাম্প্রদায়িক বাঙালি। পাকিস্তানি জাানায় বেঁচে থাকলে জিন্নাহর চালবাজির রাজনীতি লালন মানতে পারতেন না, যেমন পারেননি ভাসানী। গান্ধীর সঙ্গে খানিকটা মিল থাকলেও তাঁর ধর্মীয় আবরণে মোড়ানো রাজনীতিও লালনের কাছে গ্রহণযোগ্য হত না। গান্ধী অহিংসবাদী হলেও অর্থনৈতিক সমতায় বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু লালন ও ভাসানী দু জনেই সমতাভিত্তিক সমাজ-দর্শনে বিশ্বাস করতেন। জিন্নাহর মতো গান্ধীও ছিলেন সমাজের উঁচুতলার মানুষ। গরিবানা হালে, দীনদরিদ্র বেশে ঘোরাফেরা করলেও গান্ধীর পেছনে কংগ্রেস ও ভারতের জাতীয়তাবাদী অভিজাতদের যে প্রচুর খরচ হত সেটা আর কোনো গোপন ব্যাপার নয়। সাজপোশাকে, ফ্যাশান-স্টাইলে, বক্তৃতার ভাষাভঙ্গিতে হেরফের থাকলেও গান্ধী ও জিন্নাহ দুজনেই ছিলেন বড়লোকদেও নেতা। লালন ও ভাসানী দু জনেই ছিলেন নিচুতলার মানুষ ও খাঁটি বাঙালি। তারা নিজের মতো করে জীবনযাপন করে গেছেন। দুজনেই গরিব-দুঃখী, নিঃস্ব-রিক্ত তথা ব্রাত্যজনকে ক্ষমতায়িত করতে চেয়েছেন। লালন যে ভাসানীর মতো আপসহীনভাবে কৃষক-শ্রমিক তথা আমজনতার সামগ্রিক

মুক্তির জন্য কাজ করে যেতেন তা বলাই বাহুল্য।

লালন ও ভাসানী দুজনেই মুক্তিপিয়াসি সংগ্রামী পুরুষ, কিন্তু তাদের সংগ্রামের কাফেলা শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত বিজয়ের শীর্ষবিন্দু ছুঁতে পারেনি, দেখে যেতে পারেননি রোদ-ঝলমলে মানবিক সমাজ । সুনির্দিষ্ট কোনো সাংগাঠনিক-পরিকাঠামো বা ব্যবস্থাপনাও রেখে যেতে পারেননি আগামী প্রজন্মের জন্য। তবে দুজনের মধ্যেই মানবমুক্তির স্বপ্ন ছিল। উঁচু-নিচু, আশরাফ-আতরাফের ভেদ ঘুঁচিয়ে জাতকূল-গোত্রহীন মুক্ত-মানবসমাজের বলে গেছেন লালন। তবে লালন-দর্শন বাস্তবায়নের জন্য যে-উচ্চায়ত চিন্তার মানুষ বা শিষ্যবর্গ প্রয়োজন ছিল সেটা লালন ও তার সাক্ষাৎ শিষ্যরা বানাতে পারেননি। লালন-উত্তর দুদ্দু শাহ, মনিরুদ্দীন শাহ, বেহাল শাহ, শুকচাঁদ ফকির, অমূল্য গোঁসাই, মহেন্দ্র ক্ষ্যাপারা আসর-মাতানো গায়ক ছিলেন, কিন্তু লালনীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে ভক্ত-অনুরাগীদের উদ্বুদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ করার মতো মনস্তাত্ত্বিক ও সাংগাঠনিক শক্তি ছিল না। ভাসানীও বুঝেছিলেন বাংলাদেশের মানুষের জন্য একটি সমতাভিত্তিক স্বাধীন ভূখণ্ড প্রয়োজন। কিন্তু তাঁর মুরিদ ও অনুসারীরা ভাসানীর লালিত স্বপ্নের সফল বাস্তবায়ন করতে পারেননি। যদি পারতেন তাহলে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের রূপ-চেহারা, রাজনীতির চালচিত্র অন্য রকম হতে পারত। ভাসানী ও লালনকে নিয়ে বিতর্ক আছে, আগামীতেও থাকবে, তারপরও দুজন জনমানস ও পরিসরে প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকবেন। যে কারণে রুমি-রবীন্দ্রনাথ, গালিব-ইকবাল থেকে নজরুল-সুকান্ত বেঁচে থাকবেন, ওই একই কারণে লালন ও ভাসানী মানব মুক্তির সুহৃদ-সারথি, গাইড-ফিলোসফার হিসেবে বেঁচে থাকবেন।

লেখক: অধ্যক্ষ (ভা.), মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ। ফোন: ০১৮১৬-৬৯৩৪

১৬ বছর পর গাংনীর রাইপুর ইউনিয়ন বিএনপির কাউন্সিল

দীর্ঘ ১৬ বছর পর বিপুল উৎসাহ, উদ্দীপনা ও উৎসবমুখর পরিবেশে

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রাইপুর ইউনিয়ন বিএনপির দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার (২০ এপ্রিল) দুপুরে রাইপুর ইউনিয়নের কেএবি মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে এই কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়।

ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে মোট ৪৫৯ জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন রবিউল ইসলাম, হাফিজুর রহমান ও হাসিবুল ইসলাম। সাধারণ সম্পাদক পদে প্রার্থী ছিলেন খলিলুর রহমান ও জাফর আলী।

কাউন্সিল শুরুর আগে আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

আয়োজক কমিটির সদস্য আব্দুল আওয়ালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, যুগ্ম আহ্বায়ক ফয়েজ মোহাম্মদ, সদস্য আলমগীর খান সাতু, আমিরুল ইসলাম, কাজী মিজান মেনন, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি রেজাউল হক, জেলা আহ্বায়ক কমিটির সদস্য মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, আখেরুজ্জামান, আলফাজ উদ্দিন কালু, গাংনী পৌর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও পৌরসভার সাবেক ভারপ্রাপ্ত মেয়র ইনসারুল হক ইনসু এবং জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাউছার আলী।

জনসভা পরিচালনা করেন জেলা যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য আব্দাল হক।

সমাবেশ ও ভোটগ্রহণ ঘিরে স্থানীয় নেতাকর্মীদের মাঝে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়েছে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নেতা নির্বাচনের এমন উদ্যোগে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বিএনপি নেতাকর্মীরা।

আগামীকাল সোমবার গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়ন বিএনপির কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হবে।

জেলা বিএনপির আহ্বায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন বলেন, “দেশব্যাপী তৃণমূলের মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটিগুলো পুনর্গঠনের অংশ হিসেবে প্রাথমিকভাবে গাংনী উপজেলার ৯টি ইউনিয়ন ও একটি পৌর ইউনিটে দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। স্বচ্ছ ও গণতান্ত্রিক

প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এসব ইউনিটের নেতৃত্ব নির্বাচন করা হবে। এর লক্ষ্যে বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীদের নিয়ে কাউন্সিল আয়োজন কমিটি গঠন করা হয়েছে।”

সোস্যাল মিডিয়া, ভিউ ও তরুণ প্রজন্ম

প্রত্যেক মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি হলো অন্যের কাছে নিজেকে গ্রহণযোগ্য ও আকর্ষণীয় করে তোলা। অতীতে মানুষ নিজের মেধা, বুদ্ধি, আচার-আচরণ ও ব্যক্তিত্ব না দর্শনগত উপস্থাপনার মাধ্যমে অন্যের কাছে নিজের গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করত। কিন্তু বর্তমানে প্রযুক্তির অভাবনীয় পরিবর্তনের ফলে নিজের গ্রহণযোগ্যতা তৈরির জন্য প্রযুক্তিগত পন্থাকে ব্যবহার করছে। এসব পন্থার মধ্যে অন্যতম হলো মোবাইল অ্যাপস টিকটক, ফেসবুক রিলস, ইন্সটাগ্রাম। এই সব অ্যাপসের মাধ্যমে ১৫ সেকেন্ড, ৩০ সেকেন্ড যেকোনো ভিডিও তৈরি করা যায় এবং যা খুব সহজেই তা অন্য কোনো সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করা যায়। আবার অন্য কারো তৈরি করা কোনো গান বা অভিনয়ের মধ্যে ঠোঁট মিলিয়ে নিজের অভিনয়শৈলী প্রকাশ করা যায় টিকটকের মাধ্যমে।

টিকটক একটি মোবাইল এ্যাপস হলেও এর নেতিবাচক প্রভাব তরুণ প্রজন্মকে বিশেষ করে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে বাস্তব থেকে। এদের মধ্যে উগ্রতা, অশালীনতা, অশ্লীলতা, কল্পনাপ্রবণতার মতো বিভিন্ন জটিল মানসিক রোগ তৈরি করছে। অতিরিক্ত টিকটকের ব্যবহারের ফলে মানসিক ভারসাম্যহীনতা, বাস্তবতার প্রতিবিমুখতা, মনস্তাত্ত্বিক অবক্ষয় ও চারিত্রিক অবনতির মতো ভয়ানক জটিল মানসিক সমস্যা দেখা দিয়েছে। সামগ্রিকভাবে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে।

টিকটক অ্যাপসের ব্যবহারের কারণে এমন কিছু নেতিবাচক ঘটনা ঘটেছে, যার ফলে ভিডিও আপলোডকারীকে জীবনের ইতি টানতে হয়েছে। প্রায়শই পত্রিকার বদৌলতে জানা যায়, টিকটক ভিডিও বানাতে যেয়ে ট্রেনে নিচে কাটা পড়ে কিশোরের মৃত্যু বা ভিডিও বানাতে যেয়ে ট্রেনে উপর থেকে

পড়ে যুবকের মৃত্যু। প্রাইমারী স্কুলে পড়া ছাত্রী ভিডিও বানাতে গিয়ে মৃত্যু। এমন খবর হরহামেশাই শোনা যায়। বস্তুত শিশু-কিশোর, তরুণ কিংবা বৃদ্ধ কেউই বাদ পড়ছে না টিকটক আসক্তি থেকে। শিক্ষার্থীদের বড় একটি অংশ এসব ভিডিও তৈরি কিংবা উপভোগ করতে গিয়ে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময়কে হারিয়ে ফেলছে নিজের অজান্তেই। যে সময়ে তাদের সিলেবাস শেষ করার কথা, সে সময়টাতে তারা টিকটক নামের এই অপ্রয়োজনীয় এবং সময় অপচয়কারী প্লাটফর্মে নিজেদের বিলিয়ে দিচ্ছে।

টিকটক নতুন মিডিয়া। তরুণ সমাজ এর সঙ্গে কতটুকু কীভাবে যুক্ত সেই বিষয়গুলো দেখার আছে। পাশাপাশি এর ইতিবাচক দিকও তো আছে। আমাদের যারা নীতিনির্ধারক অনেক সময় তাদেরও বোঝাপড়ায় ঘাটতি থাকে। তারা ক্রিটিক্যালভাবেই বিষয়টা দেখে। টিকটকের সবাই মনে করে, বখাটেরাই এটা ব্যবহার করে। এটা কোন ভদ্র মানুষের কাজ না। টিকটককে যে ধরনের কনটেন্টের মধ্যে ফ্রেমিং করা হয়, টিকটক কিন্তু সেই ধরনের কনটেন্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ না। সেখানে কিন্তু ভালো কনটেন্টও থাকতে পারে। অনেকে ভালো কনটেন্টও বানাচ্ছে। সেটা মজার হতে পারে, শিক্ষামূলক হতে পারে, বিনোদনমূলক হতে পারে। সেই সুস্থ্য বিষয়টা এখানে অনেক ক্ষেত্রেই মিসিং হয়ে যায়। খারাপের দিকেই মানুষের আগ্রহ বেশি।

টিকটক, ইনস্টাগ্রাম, স্ন্যাপচ্যাট, ফেসবুক, ইউটিউব সব জায়গায় এই শর্ট ভিডিও কনটেন্টের ছড়াছড়ি। বিনোদন নেওয়ার বাহানায় রিলসে ঢুঁ মারার স্বভাবও হয়ে গেছে ব্যবহারকারীদের। অথচ কয়েক সেকেন্ডের এই রিলসগুলোই কাজ করার ক্ষমতা কমিয়ে দিচ্ছে, মনোযোগ কেড়ে নিচ্ছে অজান্তে, বিষণ্নতা উপহার দিচ্ছে, মানসিক অশান্তির কারণ হয়ে যাচ্ছে। কীভাবে করছে এসব ক্ষতি হচ্ছে হচ্ছে?
সামাজিক মাধ্যমের স্ক্রলিং ক্যাফেইনের নেশার মতো। অফুরন্ত কনটেন্ট ডোপামিনের ফিডব্যাক লুপ সৃষ্টি করে। যা থেকে মনোযোগ সরানো একেবারেই সহজ নয়। এভাবে শুধু সময়ই অতিবাহিত হয় না, বরং কাজের ক্ষমতাও চলে যেতে থাকে আঙুলের স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে।

রিলস আকারের ছোট ভিডিওগুলো একেতো সংক্ষিপ্ত, চটকদার, তেমনি আবার বিভ্রান্ত করার ক্ষেত্রেও চমৎকার। র্যাপিড ফায়ার ফরম্যাটের রিলসগুলো কোনোকিছু মনেই রাখতে দেয় না। কয়েকটি ভিডিও দেখার পর কোন ভিডিওর পর কোনটি মনে থাকা দুষ্কর। কয়েকটি মনে পড়লেও অধিকাংশই স্মৃতি থেকে হারিয়ে যায়। কারণ রিলস প্যাসিভ ভিউকে উৎসাহিত করে, যেখানে কোনো ভিডিও স্থায়ী প্রভাব ফেলে না। রিলস

স্বল্পমেয়াদী স্মৃতির মতো ক্ষণস্থায়ী। আর অস্থায়ীত্ব ভুলে যাওয়ার প্রবণতা বাড়িয়ে দেয় ভীষণভাবে। উদ্দেশ্য ছাড়া স্ক্রল করতে থাকলে জ্ঞানীয় ক্ষমতা ও মনোযোগ দুর্বল করে দেবে ব্যাপক হারে। চলমান ডিজিটাল বিপ্লবকালে নৈতিক উদ্বেগ নিয়ে সমালোচনা করতে গেলেও রিলসের প্রভাব অবহেলা করা যাবে না। রিলসের রোলারকোস্টার মানসিক সুস্থতার ওপরও প্রভাব ফেলছে।
ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামেও রয়েছে রিলস, ইউটিউবে শর্টস। আলাদা নাম হলেও জিনিস কিন্তু একই। কনটেন্টগুলো হয় খুবই আকর্ষণীয়। এই শর্ট ভিডিও গুলো, আস্তে আস্তে মানুষকে আবেগশূন্য করে দিচ্ছে, কারও মৃত্যুর খবরে এখন আমাদের কষ্টের স্থায়িত্বকাল মাত্র ৩ সেকেন্ড, কোনো দুর্ঘটনার খবর আর আমাদের শরীরকে অসার করে দেয় না, মনে কষ্ট নিয়ে আঙুলের ইশারায় ফোনস্ক্রিন স্ক্রল করে নিচে নেমে কোনো কৌতুকপূর্ণ রিলে পরমুহূর্তেই আমাদের ঠোঁট প্রসারিত হয়, চোখে আনন্দের ছাপ পরিলক্ষিত হয়, আমরা পরিণত হই আবেগহীন, যন্ত্রমানবে…

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এখন বহু মানুষের উপার্জনের একটা ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। আর এই উপার্জন করতে লাইক, ভিউ বেশি লাগে। বেশি ভিউ বা লাইক পেতে দ্রুত জনপ্রিয় হয় এমন সব কনটেন্ট তৈরি করছে তরুণেরা। পাশাপাশি নিজেকেও গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে জাহির করার একটা চেষ্টা আছে। এই কাজ করতে গিয়ে তারা এমন সব কনটেন্ট তৈরি করছে যা বাংলাদেশে আইনে অপরাধ।

সস্তা জনপ্রিয়তা সমাজে নতুন করে দেখা দিয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়া আসার পরই এটা বেশি করে দেখা যাচ্ছে। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কনটেন্ট তৈরি করে তারা বেশি লাইক বেশি ভিউ মাথায় রাখে। এটার দুটো দিক আছে। একটা সরাসরি অর্থনৈতিক দিক, আরেকটি হল সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেকে জাহির করা। নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে উপস্থাপন করা। অর্থনৈতিক দিকটা হল, কারও পেজে যদি অনেক লাইক বা কনটেন্টে অনেক ভিউ হয় সেটা ফেসবুক বা ইউটিউবে বা অন্য কোন মিডিয়ায় তাহলে সেটা মনিটাইজ করা সম্ভব। সেখান থেকে অর্থ উপার্জন করাও সম্ভব। এই অপশনটার কারণে মানুষ এখন বেশি ভিউ, বেশি লাইকের পিছনে ছুটছে। এই বিষয়গুলো সাম্প্রতিক সময়ে ব্যবহারকারীদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। এখানে যতটা না অর্থনৈতিক তার চেয়ে বেশি মনস্তাত্ত্বিক। কারণ তারা নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে জাহির করতে চান।

সম্প্রতি ভাইরাল খ্যাত ক্রিম আপা বা কিরিম আপার বেশ কিছু ভিডিও টিকটিক বা ফেসবুকে আসছে। কখনো কড়া রাসায়নিকে মেয়ের চুল রং করে

দিচ্ছেন। কখনো মাথার চুল ন্যাড়া করে দিচ্ছেন। কান ফুটো করার বন্দুকের মতো যন্ত্র দিয়ে কান ফুটো করে দিচ্ছেন। কানে ভারী কানের দুল পরিয়ে কড়া মেকআপ করাচ্ছেন। বাজে গালি দিচ্ছেন, মেয়ের মুখের সামনে থেকে খাবার কেড়ে নিচ্ছেন, মেয়ের মুখে কুলি ফেলাসহ, ধমক দেওয়া, ঘুমন্ত মেয়েকে ঠেসে খাওয়ানো, চড় মারাসহ নানা কাজ করে যাচ্ছেন ক্যামেরার সামনে। শুধু মাত্র ভিউ পাওয়ার আশায় একজন মা এমন নির্দয়মূলক কাজ করে যাচ্ছেন।

আবার উদ্যোক্তার কথা না বললেই না। রোবাইত ফাতিমা তনি ফেসবুকে পণ্য নিয়ে লাইভে এসে অশালীন ভাষায় গালাগালি করে। কখনো আবার লাইভেই সালোয়ার পরে দেখাচ্ছেন। বয়সের অসামঞ্জস্য স্বামীকে লাইভে এনে সুগার ড্যাডি খ্যাতি দিয়ে দর্শকের মন মাতিয়ে ভিউ বাড়াচ্ছে। কখনও আবার মায়া কান্না করে পণ্য বিক্রি করছেন।

তবে একটু ভালো করে খেয়াল করলে বোঝা যায় এরা মানসিকভাবে অসুস্থ। ভিডিওর কমেন্ট বক্স ভরে বাজে কমেন্টে। এদের কাছে একটাই মুখ্য বিষয় হল ভাইরাল হলেই ভিউ। এই ভিউ কনসেপ্ট প্রজন্মকে আকৃষ্ট করে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে ।
এখন প্রশ্ন হতে পারে সোসাল মিডিয়ার কারণে কী তরুণরা অপরাধমূলক কাজে উৎসাহিত হচ্ছে?

সোশ্যাল মিডিয়া হল বিজনেস মডারেট সামাজিক নেটওয়ার্ক। প্রথমে বিষয়টা এমনই ছিল। উৎসাহিত করার বিষয়ে সরাসরি তাদের দায়ী করতে পারবেন না। ওরা চায় যে কোনো প্রকারে মানুষ এটাতে যুক্ত থাকবে। যত ব্যবহারকারী বাড়বে তত তাদের লাভ। সেজন্য তারা সিস্টেমটাকে সেভাবে সেট করে। যে কনটেন্টগুলো মানুষ বেশি দেখে সেগুলোকে তারা সামনে এনে দেয়। পরোক্ষভাবে দায়ী হলেও সরাসরি বলা যাবে না। এখানে ব্যক্তির দায় যেমন আছে, তেমনি সমাজের অপরাপর মানুষেরও দায় আছে। একটা খারাপ ভিডিও এত ভাইরাল হবে কেন? এখানে সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে শিক্ষারও একটা দিক আছে। ঠিকমতো বোঝার একটা বিষয় আছে। চটকদার কিছু হলেই আমরা সেটাতে ক্লিক করি। এখানে ব্যবহারকারী হিসেবেও আমাদের একটা দায়িত্ব আছে এবং বোঝার ব্যাপার আছে। আমি কিন্তু একটা জিনিস দেখলাম আর সেটা শেষ হয়ে গেল, তেমন না। এখানে আমারও কিন্তু দায় আছে।

আমরা যখন কৈশোর পেরিয়েছি তখন পর্ণ বা পর্ণগ্রাফি শব্দ শুনলেই আড়ষ্ট হয়ে যেতাম। কিন্তু এখন এই বিষয় নিয়ে নেই কোনো আড়ষ্টতা, নেই সহজাত লজ্জা। বরং ছোট বাচ্চাদের থেকে শুরু করে

প্রাপ্তবয়স্কদের মাঝে পর্ণগ্রাফিতে আসক্তির মাত্রা ভয়াবহ আকারে বেড়ে চলেছে। এর কারণ হলো ইন্টারনেটে এসব ভিডিও বা অডিওর সহজলভ্যতা, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বিভিন্ন ব্লগ, রিলস, টিকটক ভিডিওর উসকানিমূলক প্রচারণা।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অন্যের আনন্দময় মুহূর্ত উপভোগ করতে করতে নিজের অবস্থার সঙ্গে অহেতুক তুলনা করছি আমরা। কোনো ট্রেন্ড দেখলে তা অনুকরণ করার প্রতিযোগিতা নেমে পড়ছি? অথচ কারোর জীবনই মসৃণ নয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সকলে ইতিবাচকতা তুলে ধরে। মুদ্রার বিপরীত দিকের চিত্র কখনো দেখা যায় না রিলসে। এতে করে অসন্তুষ্টি ও বিষণ্নতা জাপটে ধরছে।
তবে টিকটক রিলসের মাধ্যমে একাকিত্ব কাটানোর উপায়, ব্যবসার বিজ্ঞাপন, পণ্যের প্রচার, সচেতনতামূলক তথ্য পাওয়া যায় তা মানতে হবে। তবে এটির বিনিময়ে ইনফ্লুয়েন্সার, ভøগারদের কনটেন্ট আমাদের থেকে যে প্রতিদান নিচ্ছে তা বিস্তর বটে। আদান-প্রদানের এই ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার আগেই বাস্তবতা প্রাধান্য দিয়ে চলতে হবে। যতটুকু সম্ভব কাজে ব্যস্ত থেকে রিলসের আসক্তি এড়িয়ে চলতে হবে। মনে রাখবেন, সুন্দর মেকি জীবন নয়, অসুন্দর বাস্তবতাই আমাদের সঙ্গী। বর্তমান সময়ে আমাদের আপন সমাজের কেমনতর অবয়ব তা সচেতন সামাজিক মাত্রেরই জানা। তথাপি নানাবিধ অপরিহার্য ব্যস্ততা হেতু আপন স্বার্থেই আপন চেহারা অবলোকন করে নেওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

ফেসবুকের নীল দুনিয়ায় গ্রন্থাগার হারিয়ে যাচ্ছে

১৮৫০ সালে যুক্তরাজ্যে পাবলিক লাইব্রেরি এ্যাক্ট পাশ হয়। যদিও সেই আইন পাশ করতে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অভিজাত ও রক্ষণশীল সদস্যগনের অনেকে শিক্ষা ও সচেতনতা তৈরীর কাজে রাজকোষের অর্থ ব্যয়ের বিপক্ষে ছিলেন। তারপরেও আইনটি পাশ হয়ে যায়। ওই আইন পাশের পর ১৮৫৪ সালে এই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয় ৫টি গণগ্রন্থাগার। এগুলো হলো যশোর, বগুড়া, রংপুর, বরিশাল ও হুগলি পাবলিক লাইব্রেরি। যেসময় এসব লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা হয় সেসময়ও কলকাতা বিশ^বিদ্যালয়

গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার অধিকার পায়নি।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে দ্য ব্রিটিশ ওয়ার্কম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত হয় যে, ইংল্যান্ডের কুম্ব্রিয়া অঞ্চলের আটটি গ্রামে একটি ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার ক্রিয়াশীল অবস্থায় রয়েছে। জর্জমুর নামক একজন সমাজসেবী ব্যবসায়ী ভালো ভালো সাহিত্যকর্মকে গ্রামীণ জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে এই প্রকল্পর সৃষ্টি করেন। আমাদের দেশে বিশ^সাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ একজন বহুমুখী ব্যক্তিত্ব। অধ্যাপনা করেছেন তিনি ১৯৬২ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত ত্রিশ বছর ধরে। তিনি অনুভব করেছেন যে, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে প্রয়োজন আলোকিত মানুষ। ১৯৭৮ সালে তিনি বিশ^সাহিত্য কেন্দ্র ও ভ্রাম্যমান লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেন।

২৩ বছর বয়সের আসাদের বাড়ি জামালপুর জেলার সরিষা বাড়িতে। পড়াশোনার পাশাপাশি রাজমিস্ত্রির সহকারী হিসেবে কাজ করেন। এলাকায় বই পড়ার অভ্যাস গড়াতে ২০১৮ সালে ২০টি বই নিয়ে একটি পাঠাগার চালু করেন। তার পাঠাগারে দুই হাজারের বেশী বই এখন। আসাদ আশপাশের গ্রামগুলোর যুবকদের বই পড়ার অভ্যাস গড়াতে নিজে সাইকেল চালিয়ে বড়ি বাড়ি গিয়ে বই দিয়ে আসেন। আগের দেয়া বই নিয়ে আসেন। এলাকার কতশত জন এখন তার পাঠাগারে বসে জ্ঞান অর্জন করছে। পাঠাগারটির একটি ফেসবুক গ্রুফ আছে। সেখানে আছে বইয়ের তালিকা। গ্রুপের সদস্যরা গ্রুপে লেখকের ও বইয়ের নাম জানালেই আসাদ সাইকেল চালিয়ে বই পৌছে দেন। দিনমজুর বাবার সবচেয়ে ছোট ছেলে আসাদ এই পাঠাগার নির্মাণ করে আকাশ হয়ে গেছেন। কেউ তাকে আর ছুঁতে পারেনা।

অর্থনৈতিক সংকটের কারণে ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করে পলান সরকার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ইতি টানেন। কিন্তু বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলেন। পলান সরকারের নানা ময়েন উদ্দিন সরকার স্থানীয় ছোট জমিদার ছিলেন। নানার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে ৪০ বিঘা সম্পত্তির মালিক হন। পলান সরকার রাজশাহী জেলার ২০ টি গ্রামজুড়ে গড়ে তুলেছেন অভিনব শিক্ষা আন্দোলন। নিজের টাকায় বই কিনে তিনি পড়তে দেন পিছিয়ে পড়া গ্রামের মানুষদের। প্রতিদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে কাঁধে ঝোলাভর্তি বই নিয়ে একেকদিন যেতেন একেক গ্রামে। বাড়ি বাড়ি কড়া নেড়ে আগের সপ্তাহের বই ফেরত নিয়ে নতুন বই পড়তে দেন। এলাকাবাসীর কাছে তিনি পরিচিত ‘বইওয়ালা দাদুভাই’ হিসেবে। ২০০৯ সালে রাজশাহী জেলা পরিষদ তার বাড়ির আঙিনায় একটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেন। ২০১১ সালে সামাজসেবায় অবদানের জন্য রাষ্ট্রের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সম্মান একুশে পদক লাভ করেন। ২০১৯ সালের ১

মার্চ তিনি মৃত্যুবরণ করেন। পলান সরকারও আকাশ হয়ে গেছেন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আসাদ, পলানের মতো মানুষের জন্ম হয়েছে। তাদের অনেকেই আকাশ হতে পেরেছেন। আমরা তাদের স্মরণ করিনা।

বই হচ্ছে জ্ঞানের ভান্ডার তাই প্রতিটি লাইব্রেরি, স্কুলে গ্রন্থাগার হচ্ছে জ্ঞান ভান্ডারের একটি স্থান বা উৎস। তাইতো লাগোস হোপ দেশে দেশে ঘুরছে বই নিয়ে। যেমন আমাদের দেশে ঘোরে গাড়ি ভর্তি বই নিয়ে ভ্রাম্যমান লাইব্রেরি। ১৯৭০ সাল থেকে জার্মাণ ভিত্তিক জিবিএ শিপ থরে থরে সাজানো বই নিয়ে বিশ^ব্যাপি বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি ছড়িয়ে দিতে ১৯৭০ সালে দুটি জাহাজভর্তি বই নিয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ান। এপর্যন্ত ১৫১ দেশ ভ্রমন করেছে। অথচ আমাদের দেশের প্রতিষ্ঠিত লাইব্রেরিগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

স্কুল লাইব্রেরি প্রতিটি শিক্ষার্থীকে জ্ঞান আহরণের জন্য নতুন আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু গ্রন্থাগারগুলো মুখো হন না শিক্ষার্থীরা। গ্রাম, শহর ও পাড়া মহল্লার লাইব্রেরিগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। সর্বশেষ ঐতিহ্যবাহী মেহেরপুর পাবলিক লাইব্রেরি কোটাবিরোধী আন্দোলনের সময় থেকে বন্ধ। একমাত্র সরকারি গ্রন্থাগারটিতেও চলছে পাঠক খরা।

মেহেরপুর সরকারি কলেজ থেকে ঢিলছোড়া দুরত্বে সরকারি বিশাল গ্রন্থাগারে তাকে তাকে সাজানো দেশ-বিদেশের বই। ঝকঝকে তকতকে উন্নতমানের কাঠের চেয়ার-টেবিল আর টাইলস করা মেঝে। অতি আধুনিক সুযোগ-সুবিধা ও আধুনিকতার ছোঁয়া থাকার পরও পাঠকশূন্য গ্রন্থাগার। পাঠক খরায় ভৌতিক পরিবেশ গ্রন্থাগারটিতে। এমন অবস্থা দেখা গেছে মেহেরপুরে সরকারি গণগ্রন্থাগারে।

১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে ড. শহীদ সামসুজ্জোহা পার্কের সামনে একটি ভাড়া ভবনে সরকারি গণগ্রন্থাগারটির যাত্রা শুরু। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে ওয়াবদা সড়কে এডভোকেট আফরোজা বেগমের বাড়ির নিচতলায় ভাড়া বাড়িতে ছিলো কুড়ি বছর। ২০১২ খ্রিস্টাব্দে সরকারি কলেজ থেকে ঢিলছোড়া দুরত্বে নিজস্ব ভবনে গ্রন্থাগারটির উদ্বোধন হয়। প্রথম দিকে সেখানে অনেক পাঠক ছিলো। তবে ক্রমে পাঠকশূন্য হয়ে যাচ্ছে দৃষ্টিনন্দন গ্রন্থাগারটির। পাঠক ফেরাতেও নেই কোনো উদ্যোগ। অথচ গ্রন্থাগারটিতে পাঠকদের জন্য ৩৭ হাজার ৫০৫টি বই রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে গল্প, উপন্যাস, কবিতা, ধর্মীয় ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বই। অভিধানসহ ইংরেজি ভাষারও বেশ কিছু বই এখানে রয়েছে। এছাড়া গ্রন্থাগারে প্রতিদিন ৫টি বাংলা, ২টি ইংরেজি দৈনিক ও বেশ কয়েকটি

ম্যাগাজিন রাখা হয়। এখানে এক সঙ্গে ৩০ জন পাঠকের নিরিবিলি পরিবেশে বসে বই পড়ার ব্যবস্থা রয়েছে। সপ্তাহের বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার ছাড়া প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত খোলা রাখা হয়। সেখানে শিশুদের জন্য পৃথক পাঠচক্র ব্যবস্থা আছে। শহরের একপ্রান্তে হবার কারণেই এখানে পাঠক কমে গেছে।

জেলা শহরে আছে সরকারি কলেজ, সরকারি মহিলা কলেজ, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বেসরকারি পাবলিক লাইব্রেরি (গ্রন্থাগার) আছে, কিন্তু প্রাণহীন। নেই পাঠকের কোলাহল। আলমারিতে বন্দি বই, হয়তো খোলাই হয় না বহুদিন। কোথাও বইয়ের কিছু সংগ্রহ আছে, তবে তাকে লাইব্রেরি বলা চলে না। কোথাও কোথাও লাইব্রেরিয়ান থাকলেও অযত্ন-অবহেলায় পড়ে আছে বইগুলো, যেন অনেকটাই অভিভাবকহীন। এমনচিত্র মেহেরপুরের সরকারি-বেসরকারি লাইব্রেরি ও সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের। মানুষকে আলোকিত করতে শতবছর আগে ১৯২২ সালে এক দানশীল শহরের বুকে ৯৭ শতাংশ জমি দান করে তাঁদের স্বর্গীয় বাবার নামে প্রতিষ্ঠা করেন ‘যোগেন্দ্র নাথ ঘোষ মেমোরিয়াল লাইব্রেরী’। ১৯৩৯ সালে তদানীন্তন এসডিও এবং পদাধিকার বলে সভাপতি এ. আর. রহমান এই লাইব্রেরিটি সম্প্রসারণ করেন এবং নতুন নামকরণ করা হয় মেহেরপুর পাবলিক ক্লাব। স্বাধীনতা উত্তরকালে বেশ কয়েক বছর ক্লাবটি বন্ধ থাকে। ৮০র দশকে ফের লাইব্রেরিটি চালু হলেও ২০০০ খ্রিস্টাব্দকালীন সময় থেকে রাজনীতি, কমিটির মধ্যে অভ্যন্তরীন বিরোধসহ নানামুখি কারণে পাঠক খরা দেখা দেয়। কোটাবিরোধী আন্দোলনের সময় থেকে জেলার সবচেয়ে বয়স্ক এই গ্রন্থাগার ‘মেহেরপুর পাবলিক লাইব্রেরি’ আর খোলা হচ্ছেনা। লাইব্রেরিটি তালাবদ্ধ। প্রতিষ্ঠানটির লাইব্রেরিয়ান খন্দকার সামসুজ্জোহা সোহাগ একটি মামলায় পলাতক আছে। সাবেক এক লাইব্রেরিয়ানের বয়ানে- একটা সময় লাইব্রেরি নিয়ে কোন রাজনীতি ছিল না। এখন রাজনীতি জায়গা করেছে লাইব্রেরিতে।

মেহেরপুর জেলা শহরে আলেয়া কামেল মাদ্রসা লাইব্রেরি কক্ষে গিয়ে দেখা যায়, সেটি মূলত লাইব্রেরি নয়, কক্ষের এককোণে আলমারিতে কিছু বই রাখা। শিক্ষার্থীরা বলছে, সেটিই নাকি তাদের লাইব্রেরি। শিক্ষার্থীদের লাইব্রেরি বা গ্রন্থাগার সম্পর্কে তেমন ধারণাই নেই।

মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় দাঁড়িয়ে রয়েছে ভবনকে বুকে নিয়ে। সেই ভবনে কাগজ কলমে ২৯শ বইয়ে ভরা গ্রন্থাগার। তিনবছর আগে পাওয়া বই এখনও প্যাকেট বন্দি হয়ে। গ্রন্থাগারে এসএসসি পরীক্ষার কাগজপত্রসহ, স্কুলের পুরাতন খাতা ও অন্যান্য সামগ্রিতে ভরা।

অনেকটা স্টোর রুম হিসেবেই ব্যবহার হচ্ছে গ্রন্থাগারটি। করোনাকালীন সময় থেকে কোনদিন গ্রন্থাগার খোলা হয়নি। বইগুলো রয়েছে দুরাবস্থায়। দির্ঘবছর লাইব্রেরিয়ান পদটি শূন্য। বিদ্যালয়ের ধর্ম শিক্ষক মোসস্তাফিজুর রহমান ও ইংরেজি শিক্ষক বাসাদ আলী মর্নিং ও ডে শিপটে লাইব্রেরিয়ানের দায়ীত্বে আছেন। কিন্তু বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা লাইব্রেরিমুখো হন না।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক জানান, স্কুলের গ্রন্থাগার নিয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি অভিযোগ আছে। প্রতিবছর ভর্তির সময় তাদের কাছ থেকে লাইব্রেরি ফি নেয়া হয়। কিন্তু তাদের বই নিতে হলে আবেদন করে বই নিতে হয়। তাছাড়া প্রতিদিনই গ্রন্থাগার বন্ধ থাকে। দশম শ্রেনির এক শিক্ষার্থী জানান- বই পড়ার মাধ্যমে, তারা নিজেদেরকে নতুন জিনিস, নতুন তথ্য, সমস্যার সমাধান করার নতুন উপায় অর্জনের মাধ্যমগুলো খুঁজে পায়। কিন্তু কোনদিন লাইব্রেরি খোলা হয় না। বেশ কয়েখজন শিক্ষার্থী জানান- গ্রন্থাগার নিয়ে কথা বললে স্যারেরা পরে বকা দেবেন। শিক্ষার্থীরা স্বীকার করেন গ্রন্থাকার কোনদিনই খোলা থাকেনা।

মর্নিং শিফটের লাইব্রেরিয়ানের দায়িত্বে থাকা ধর্ম শিক্ষক মোস্তাফিজুর রহমানের সাথে সরেজমিনে গ্রন্থাগারে গিয়ে বই প্রদানের রেজিস্ট্রারে গত তিন বছরে কোন শিক্ষার্থীর নামে বই ইস্যু করা দেখা যায়নি। দেখা যায় বইয়ের আলমারির পাশে এসএসমি পরীক্ষার বস্থাবন্দি খাতা, স্কুলের পুরাতন রেজিস্টারসহ অন্যান্য সামগ্রিতে ভরা। একটি চৌকিও দেখা যায়। ওই চৌকিতে কম্পিউটারের পিন্টারসহ বিভিন্ন সামগ্রি। মোস্তাফিজুর জানান- পাঠ্যভাস কর্মসূচির ৪৮৪টি মিলে মোট বই রয়েছে ২৮৮৪টি। এই করোনাকালীন সময় থেকে কোন ছাত্র গ্রন্থাগারমুখো হয়নি। নাম প্রকাশে একজন শিক্ষক জানান- সপ্তাহে একদিন ভ্রাম্যমান বই লাইব্রেরি আসে স্কুলে। কোন শিক্ষার্থী ওই ভ্রাম্যমান লাইব্রেরি থেকেও বই পড়েনা।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. শরিফুল ইসলাম জানান- আমরা নিয়মিতভাবে লাইব্রেরি ব্যবহার করার জন্য আমাদের ছাত্র/ছাত্রীদের অনুপ্রাণিত করি। শিক্ষকদের প্রতি রাস্ট্রিয় নির্দেশ রয়েছে কোন শিক্ষার্থীর সাথে উচ্চস্বরেও কথা বলা যাবেনা। ফলে শিক্ষার্থীদের শাসনের মধ্যে আনা যায় না। শিক্ষার্থীদের পাঠ্যভাস গড়ে তোলাসহ শিক্ষকদের অনেক নির্দেশই উপেক্ষিত থেকে যায়।

মেহেরপুর মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর আবদুল্লাহ

আল আমিনের বয়ানে, শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ড্রয়িংরুমে আর বই রাখার আলমারি শোভা পায় না। লাইব্রেরির চেয়ারে বসে বই পড়ার দিন ফুরিয়ে যাচ্ছে। মানুষের অবসর সময় ঢুকে গেছে ফেসবুকের নীল দুনিয়ায়, টুইটারের কলরবে ইনস্টাগ্রাম নামক অনলাইনে। আমাদের মনের মগজ দখল করে নিয়েছে নতুন নতুন ডিভাইস।

আমাদের দেশের লাইব্রেরিগুলো বন্ধ হবার আরেকটি কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে মার্ক এলিয়েট জাকার বার্গের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। এই মাধ্যমটি এখন বিশে^র কোটি কোটি মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করছে নীল দুনিয়া মাধ্যমগুলো।

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক, সভাপতি মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাব ও যুগান্তর প্রতিনিধি

বর্তমান সংবাদমাধ্যম ও মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্ভাবনা

বর্তমান সময়ে ঝুঁকির কেন্দ্রে অবস্থান করছে সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যম। জুলিয়ান এসাঞ্জ থেকে জামাল খাশোগি, মিয়ানমারের সাংবাদিক ওয়া লোন এবং কিয়াও সোউ থেকে সাগর- রুনি। যারা নিজেদেরকে মৃত্যু ঝুঁকির মধ্যে রেখে অনন্য সাংবাদিকতার নজির সৃষ্টি করেছিলেন। বর্তমান যুদ্ধবিধ্বস্ত প্যালেস্টাইনে দায়িত্বশীল সাংবাদিক নিধনের ভয়াবহতা বিশ্বকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছে।

গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের এই মাধ্যমটি নিয়ে বিস্তর সমালোচনা রয়েছে। পরতে পরতে যেমন রয়েছে হলুদ সাংবাদিকতার ঘেরাটোপ, কর্পোরেট আগ্রাসনে বিপন্ন হয়ে পড়ার উদাহরণ। তেমনই রয়েছে ইতিবাচক দৃষ্টান্তও। দেশি -বিদেশি সংবাদযোদ্ধাদের নির্ভীক দায়িত্বশীলতার কারণে একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রতি বৈশ্বিক সমর্থন সহজ হয়েছিল। আবার একাত্তর পরবর্তী সময়ে সংবাদমাধ্যমগুলো বস্তুনিষ্ঠতার পরিসর সৃষ্টি করতে না পারাই বিভিন্ন আকৃতির ফ্যাসিবাদেরও উত্থান হয়েছে।

গণমাধ্যমের দায়িত্ব কেবল বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশে সক্ষম হওয়া নয় বরং পাঠকের মনে ইতিবাচকতাকে সংক্রমিত করা, জনগণকে সজাগ করে তোলা। বিশেষভাবে অনাধুনিক ও চিন্তাগতভাবে পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলোতে।
বাংলাদেশের গণমাধ্যম দুটি মোটা দাগে বিভক্ত। একভাগের কাজ হলো ক্ষমতার বাইরে থাকা রাজনৈতিক দলের হয়ে ক্ষমতামুখি গতিস্রোত তৈরি করা। অন্যভাগে ক্ষমতার পক্ষে অবস্থান করে সুবিধা গ্রহণ আর ক্ষমতাকে প্রলম্বিত করার নির্লজ্জ প্রবাহ তৈরি। যার ফলে এখানে নজিরবিহীন দুর্নীতির রেকর্ড তৈরি হয়েছে। কেবলমাত্র সংবাদমাধ্যমের নির্লিপ্ততায় অনেক মন্ত্রী এমপিসহ কর্মকর্তা কর্মচারীরা লাগামহীন দুর্নীতির সুযোগ পেয়েছে। আল-জাজিরার অনুসন্ধানী রিপোর্ট প্রকাশিত না হলে হয়তো জানাই যেতোনা জেনারেল আজিজ ও তার ভাইদের কীর্তি কিংবা সাবেক ভূমিমন্ত্রীর লন্ডনের গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় ৩৬০ টা বাড়ি সহ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অগাধ সম্পদের ফিরিস্তি।

বিশ্বস্ত গণমাধ্যমের অভাবে সমাজ, রাষ্ট্র ও জনমত গঠনের পর্যায়প্রক্রিয়া মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে। শাসকের চোখে চোখ রেখে চেতনার কোন স্ফুলিঙ্গ সংবাদমাধ্যম গুলো জ্বালতে পারেনি। বরং ক্ষেত্রবিশেষ গণতান্ত্রিক চর্চায় প্রতিকূল পরিবেশ তৈরিতে সহায়ক হয়েছে।

সংবাদ মাধ্যমকে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের ধারণায় যুক্ত করা সময় বিবেচনায় অনিবার্য। কিন্তু মানবতার পরিধির ধারণা কেবল স্বদেশে সীমাবদ্ধ নয়, বরং বিশ্বজনীন। সংবাদ মাধ্যমকে দেশকাল ধর্মের ঊর্ধ্বে থেকে দায়িত্ব পালন করতে হয়। সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যম যদি গোষ্ঠী বা রাজনৈতিক দল বা উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রতিনিধিত্ব করে তখন তার সম্ভাবনাময় আদর্শিক জায়গাগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উগ্র দেশপ্রীতিও অন্য দেশের মানবিক বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে। পশ্চিমা গণমাধ্যমের পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ পুরো মধ্যপ্রাচ্যকে অশান্ত করে রেখেছে দশকের পর দশক।

সম্প্রতি বাংলাদেশের ২৪ এর গণঅভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে ভারত বাংলাদেশের মধ্যে সংবাদমাধ্যম ও অনলাইন পোর্টালে যে তর্কযুদ্ধ বা সংবাদ উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ শুরু হয়েছে তা দুই দেশের মধ্যে বিরাজমান স্বাভাবিক সম্পর্কগুলো নষ্ট করে দিয়েছে। এজন্য গণমাধ্যমকে পেরিয়ে যেতে হয় দেশ কালের সীমা।

গণমাধ্যমের এমন দশার মধ্যে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের পশ্চাদপদ দক্ষিণ

পশ্চিমাঞ্চলের একমাত্র জনপ্রিয় পত্রিকা মেহেরপুর প্রতিদিনের ভবিষ্যৎ কি? এমন প্রশ্ন স্বাভাবিক। মারাত্মকভাবে বিভাজিত এই সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে মানুষের কথা বলা, মানুষের বুকের স্পন্দন ও অপ্রাপ্তির দীর্ঘশ্বাসকে অনুবাদ করে প্রকাশ করা এ কঠিন কর্মযজ্ঞ। তার উপরে রয়েছে অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার মতো কঠিন বিষয়। মেহেরপুর প্রতিদিনের সপ্তম বর্ষ পেরিয়ে অষ্টম বর্ষে পদার্পণ একটি বিস্ময়। এটি টিকে আছে কেবল কয়েকজন মানুষের শ্রম ও আন্তরিক পরিচর্যার কারণে। সংবাদমাধ্যমের টিকে থাকা সহজ হয় তখনই যখন সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয়তা মানুষ অনুভব করতে পারে। সামাজিক অসঙ্গতি, স্বেচ্ছাচারিতা, দুর্নীতি, অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে যেখান ব্যক্তির একক লড়াই অসম্ভব, সেখানে সংবাদমাধ্যম সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।
মানুষের কন্ঠস্বর হয়ে প্রতিবাদের ভাষা জোরালো করে। সংবাদমাধ্যমের বস্তুনিষ্ঠ অনুসন্ধান আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে যেমন সহযোগিতা করে তেমনি জনগণকেও তার দায় সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। যে কাজটি মেহেরপুর প্রতিদিন সাবলীলতার সাথে করে চলেছে। আর তার টিকে থাকার কারণও সেটি। মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রয়োজনে নয় বরং সকলের প্রয়োজনেই এর বেঁচে থাকা জরুরি। এই উপলব্ধি মানুষের মধ্যে দ্রুত জাগরিত হোক।
মেহেরপুর প্রতিদিনের জন্য শুভকামনা।

লেখক: শিক্ষক , কবি ও উপস্থাপক।

শুভেচ্ছা-ভালবাসায় সিক্ত ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’



প্রতিষ্ঠার ৮ম বছরে পদার্পণ উপলক্ষে মেহেরপুর প্রতিদিনকে শুভেচ্ছা ও ভালোবাসায় সিক্ত করেছেন শুভাকাক্সক্ষীরা। তাঁরা
বলেছেন, সত্য তথ্য পরিবেশনের
মাধ্যমে মেহেরপুর প্রতিদিন এখন
জন-জীবনের অংশ। ৭ বছর ধরে পাঠক
মেহেরপুর প্রতিদিন ওপর আস্থা
রেখেছেন, এটাই সংবাদমাধ্যমটির বড় অর্জন।

রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা, ক্রীড়াসহ বিভিন্ন পর্যায়ের বিশিষ্টজনদের উপস্থিতি মিলনমেলায় পরিণত হয় অনুষ্ঠানস্থল। আগত অতিথিরা শুভেচ্ছা বক্তব্যে বলেন, জনমানুষের কণ্ঠস্বর তুলে ধরা, বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা ও নিরপেক্ষ অবস্থানের কারণেই পত্রিকাটি সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। মেহেরপুর প্রতিদিন কখনো অন্যায়ের সঙ্গে আপস করে না। দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার মাধ্যমে পত্রিকাটি সাফল্যের এ ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে-এমনটাই প্রত্যাশা তাদের।

৭ বছর পেরিয়ে গতকাল শনিবার ৮ বছর পদার্পনে মেহেরপুর শহরের মল্লিকপাড়া মেহেরপুর প্রতিদিনের কার্যালয়ে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে মেহেরপুর প্রতিদিনকে শুভেচ্ছা জানাতে আসেন সরকারি কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, কবি সাহিত্যিক, পাঠক, সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব, সহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষসহ বিশিষ্ট ব্যক্তি ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা। অনেকে ই-মেইল ও হোয়াটসঅ্যাপে খুদে বার্তা পাঠিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তাঁরা ফুল, কেক ও মিষ্টি নিয়ে এসে শুভেচ্ছা জানান।

মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিনের সভাপতিত্বে ও



ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহবুব চান্দুর সঞ্চালনায় শুভেচ্ছা জানাতে মেহেরপুর ১ আসনের সাবেক এমপি ও
কেন্দ্রীয় বিএনপির নির্বাহী
কমিটির সদস্য মাসুদ অরুন বলেন,
মেহেরপুর প্রতিদিন দীর্ঘ সময় ধরে
প্রধান অবস্থান ধরে রেখেছে।
বর্তমানের কঠিন অবস্থার মধ্যেও
সত্যের জায়গায় রয়েছে। মানুষ কোনো ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য ওপর নির্ভর করে। তিনি বলেন, এই বিশ্বাসযোগ্যতার বিষয়টি মেহেরপুর প্রতিদিনের ৮ বছরের সবচেয়ে বড় অর্জন।

জেলা প্রশাসনের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম বলেন, ‘পাঠক হিসেবে মনে করি, দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থানের প্রেক্ষাপটে সাংবাদিকতা মেহেরপুর প্রতিদিনে হয়।’ তিনি বলেন, ‘মেহেরপুর প্রতিদিন গুণমান ও গ্রহণযোগ্যতা আরও বাড়াবে, সেই প্রত্যাশা করি।’

মেহেরপুর প্রতিদিন নিজের জীবনধারার অংশ হয়ে গেছে বলে মন্তব্য করেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহবায়ক কমিটির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান। তিনি বলেন, মেহেরপুর প্রতিদিন পুরো পরিবারের পত্রিকা। এই এলাকার মানুষের কাছে বিশ্বস্ত গণমাধ্যম। পত্রিকাটি দীর্ঘ ৮ বছরে সাংবাদিকতাকে অনন্য স্থানে নিয়ে গেছে। সংবাদের বিশ্বাসযোগ্যতার ক্ষেত্রে পাঠক মেহেরপুর প্রতিদিনের ওপর নির্ভর করে।

মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর আবদুল্লাহ আল আমিন ধুমকেতু বলেন, মেহেরপুর প্রতিদিন ৭ বছরে অতিক্রম করেছে। এই সাত বছরে মেহেরপুর প্রতিদিন কোন ক্ষমতার কাছে, কোন কর্পোরেটের কাছে নত হয়নি। বস্তুনিষ্ঠতা ও নিরপেক্ষতায় পাঠকের কাছে সমাদৃত হয়েছে। আগামীতে তারা ধারা অব্যাহত রাখবে।

সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক ড. গাজী রহমান বলেন, সংবাদপত্র বলতে যা বোঝায়, তা ধারণ করে মেহেরপুর প্রতিদিন। মেহেরপুর প্রতিদিনে পাঠকপ্রিয়তা ও আস্থার জায়গা ধরে রাখতে হবে।

জেলা আইনজীবী সমিতি মেহেরপুর সভাপতি মারুফ বিজন বলেন, গণতন্ত্রের তিনটি প্রধান স্তম্ভের কথা বলা হয়। কিন্তু গণতন্ত্র কখনোই তার

চতুর্থ স্তম্ভ ছাড়া চলতে পারে না। আর সেই চতুর্থ স্তম্ভই হলো স্বাধীন সংবাদপত্র। স্বাধীন সংবাদপত্র মানেই হলো স্বাধীন দেশে জনগণের অধিকারের কথা বলা। মেহেরপুর প্রতিদিন মেহেরপুরের ১০ লক্ষ মানুষের সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাধে তুলে নিয়েছে। আমি আশাকরি মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদকসহ সংশ্লিস্টরা তাদের সেই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবে জনগণের অধিকারের কথা তুলে ধরবে।

ব্যবসায়ী নেতা আনোয়ারুল হক কালু বলেন, সমাজের যে কোনো অসঙ্গতি যথাযথভাবে পাঠকদের সামনে তুলে ধরে মেহেরপুর প্রতিদিন।

শুভেচ্ছা জানাতে আসা ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যান্যদের মধ্যে রয়েছেন, জেলা বিএনপির সহসভাপতি আলমগীর খান সাতু, যুগ্ম আহবায়ক সহকারী অধ্যাপক ফয়েজ মহাম্মদ, মুজিবনগর উপজেলা সমবায় অফিসার মাহবুবুল হক মন্টু, অ্যাড নজরুল ইসলাম, অ্যাড, মিজানুর রহমান, মেহেরপুর চেম্বার অফ কমার্সের নির্বাহী সদস্য আনোয়ারুল হক কালু, কোষাধক্ষ্য মোহাম্মদ ফোরকান আলী, মেহেরপুর ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য মোহাম্মদ কামাল হোসেন, প্রচার সম্পাদক সাইদুর রহমান সাঈদ, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক জিয়ারুল ইসলাম, নির্বাহী সদস্য মিজানুর রহমান, ব্যবসায়ী আজিরুল ইসলাম, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও লেখক নুরুল আহমেদ, সংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব শহিদুল ইসলাম, ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব এমদাদুল হক, শিক্ষক জিয়াউর রহমান, ইমাম সাইফুল ইসলাম, কাথুলী ইউনিয়নের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোশারফ হোসেন, সাংবাদিক আমিরুল ইসলাম অল্ডাম।

এ সময় মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রতিনিধিদের মধ্যে বার্তা সম্পাদক জুলফিকার আলী কানন, দর্শনা প্রতিনিধি আহসান হাবীব মামুন, দর্শনা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি আওয়াল হোসেন, দর্শনা প্রতিনিধি ফরহাদ হোসেন, দামুড়হুদা প্রতিনিধি রাকিবুল ইসলাম এবং আইটি বিশেষজ্ঞ মুন্ত্রী জাহাঙ্গীর জিন্নাত হিরক, গাংনী প্রতিনিধি আকতারুজ্জামান, মুজিবনগর উপজেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান শেরখান, মুজিবনগর প্রতিনিধি সানোয়ার হোসেন ডালিম, স্টাফ রিপোর্টার পলাশ আহমেদ, স্টাফ রিপোর্টার সাকিব হাসান রুদ্র, ডি এম মোকিদ, ডেস্ক ইনচার্জ মোঃ রাফি হাসান, ইয়াসির ইউসুফ ইমন প্রমুখ।

মুজিবনগরে বৃদ্ধাসহ তিন নারীকে পিটিয়ে জখমের অভিযোগ

মুজিবনগরের মহাজনপুর গ্রামে পারিবারিক কলহের জেরে বৃদ্ধাসহ তিন নারীকে পিটিয়ে জখম করার অভিযোগ উঠেছে।

আহতদের মধ্যে রয়েছেন রাহিদুল ইসলামের দুই বোন জহুরা ও ফাহিমা এবং তাদের বৃদ্ধা মা সাবিরুন নেছা। রাহিদুল ইসলাম একজন ঘোড়ার গাড়ি চালক। তিনি বিয়ে করেছেন একই গ্রামের ওমর আলীর মেয়েকে। পারিবারিক কলহের জেরে চার দিন আগে তার স্ত্রী বাপের বাড়িতে চলে যান এবং সঙ্গে করে ছাগল, আসবাবপত্রসহ গৃহস্থালির অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে যান।

রাহিদুল জানান, পারিবারিক এই জটিলতা মীমাংসার উদ্দেশ্যে তার দুই বোন জহুরা ও ফাহিমা তার বাড়িতে আসেন। একপর্যায়ে শ্বশুর ওমর আলীর সঙ্গে কথাবার্তার সময় জহুরা তার ভ্যানগাড়িতে আঘাত পান। এরপর পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে পড়ে।

অভিযোগ উঠেছে, মহাজনপুর গ্রামের ফতুর ছেলে খোকা ও তার সহযোগীরা এই আক্রমণ চালায়। এ সময় জহুরা, ফাহিমা এবং তাদের বৃদ্ধা মা সাবিরুন কেউই রেহাই পাননি। জহুরার অভিযোগ, রড, লাঠি ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাদের আঘাত করা হয়েছে।

ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার বিকেল ৪টার দিকে, তবে আহতরা চিকিৎসার জন্য মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পৌঁছান সন্ধ্যা ৭টায়। দেরির কারণ জানতে চাইলে তারা জানান, খোকা ও তার লোকজন দিনের আলোতে তাদের বাইরে যেতে বাধা দেন।

রাহিদুল জানান, খোকা তার ফুফাতো ভাই এবং তাদের বসবাসের জমি রাহিদুলের বাবার দানকৃত। তাকে সেই জমি থেকে উচ্ছেদ করতেই এই হামলার ষড়যন্ত্র করা হয়েছে বলে তার দাবি।

সাবিরুন নেছাকে অক্সিজেন দিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করেন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক।

এ বিষয়ে মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান, এখন পর্যন্ত থানায় কেউ অভিযোগ দায়ের করেনি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মেহেরপুরের সাহিত্য ও সাংবাদিকতা পথিকৃৎ রামগোপাল - তারিক-উল ইসলাম

মেহেরপুরের সাহিত্য ও সাংবাদিকতার প্রসঙ্গ আসলে অবধারিতভাবে আসে দীনেন্দ্রকুমার রায় (১৮৬৯-১৯৪৩) ও যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮৭৮-১৯৪৮)-এর নাম। সমসাময়িকদের নিয়ে আলোচনায় অলক্ষে থেকে যায় আরও কয়েকটি নাম। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে রামগোপাল সান্যাল (১৮৫০ – ১৯২১)। তিনি একাধারে লেখক, সাংবাদিক ও শিক্ষক ছিলেন। শহর মেহেরপুর তাঁর জন্মস্থান, কৃষ্ণনগর ও কলকাতা ছিল তাঁর কর্মকেন্দ্র। মেহেরপুরের গদ্য সাহিত্য ও সাংবাদিকতার ইতিহাসে তাঁকে বলা যায় পথিকৃৎ।

দীনেন্দ্রকুমার ও যতীন্দ্রমোহনের পাশাপাশি মেহেরপুর শহরে জন্মগ্রহণকারী লেখক ও বৈষ্ণব সাহিত্যের বিশেষজ্ঞ জগদীশ্বর গুপ্ত (১৮৪৬-১৮৯২), পদাবলী সংগ্রাহক, লেখক ও মাসিক ‘জ্যোৎস্না’ পত্রিকার সম্পাদক রমণীমোহন মল্লিক (১৮৬৬-১৯০৫), রাধাকা›তপুর গ্রামে জন্মগ্রহণকারী নলীনীকান্ত চট্টোপাধ্যয়-স্বামী নিগমানন্দ (১৮৮০-১৯৩৫), গাঁড়াডোবে জন্মগ্রহণকারী মুন্সী শেখ জমিরুদ্দিন (১৮৭০- ১৯৩৭), এমনকি মেহেরপুর শহরের জমিদার, লেখক দীননাথ মুখোপাধ্যায় নাম উচ্চারিত হলেও রামগোপাল থেকে গেছেন আলোচনার বাইরে। মেহেরপুরের বাড়িবাঁকায় জন্মগ্রহণকারী কবি কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী (১৭৯১- ১৮৪৫)-কে নিয়ে আলোচনা হয়। মেহেরপুর শহরে বসবাসকারী কবি কৃষ্ণহরি দাস (আঠারো শতক)-কেও আনা যায় আলোচনার পাদপিঠে। দীননাথ মুখোপাধ্যায় (উনিশ শতক)-এর বই বই ‘জমীদারী বিজ্ঞান’-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৬৬ সালে হুগলীর বুধোদয় প্রেস থেকে। কিন্তু তিনিই যে মেহেরপুরের লেখক ও

প্রভাবশালী জমিদার দীননাথ মুখোপাধ্যায়, সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না। মেহেরপুর শহরে জন্মগ্রহণকারী লেখক-সাংবাদিক দীনেন্দ্রকুমার রায় ছিলেন বসুমতি পত্রিকার সম্পাদক এবং করিমপুরের জামশেদপুরে জন্মগ্রহণকারী কবি-সাংবাদিক যতীন্দ্রমোহন বাগচী ছিলেন মানসী পত্রিকার সম্পাদক। মেহেরপুর শহরের বলরাম হাড়ি (১৮২৫-১৮৯০) সম্প্রদায়ের গানও থাকে আলোচনায়।

লেখক- সাংবাদিক রামগোপাল সান্যালের বিষয়ে জানা যায় অলক রায় সম্পাদিত রামগোপাল সান্যালের দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ ‘রেমিনিসেন্স অ্যান্ড অ্যানিকডট অব আ গ্রেট ম্যান অব ইন্ডিয়া’ (১৮৯৪, ১৮৯৫)-এর সম্পাদকীয় ভ’মিকা থেকে। এতে রামগোপালের লেখক জীবনী তুলে ধরা দেয়া হয়েছে। গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্তের ‘সাংবাদিক- কেশরী হরিশচন্দ্র’ (১৯৬০) গ্রন্থে সেই তথ্য দিয়ে বলা হয়েছে, রামগোপাল সান্যালের জন্ম মেহেরপুর। ১৮৫০ সালের কয়েক বছর আগে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ঈশ্বরচন্দ্র সান্যাল। তাঁরা বাস করতেন নদীয়ার জেলা সদর কৃষ্ণনগরের গোয়াড়ি অঞ্চলে। কৃষ্ণনগরেই তাঁর লেখাপড়া। সেখান থেকেই এন্ট্রান্স ও এফ এ পাশ করেন। বিয়েও করেন কৃষ্ণনগরে। প্রখ্যাত রামতনু লাহিড়ীর ভাই শ্রীপদ লাহিড়ীর কন্যা মনমোহিনী দেবী তাঁর প্রথম স্ত্রী। মনমোহিনীর অকাল মৃত্যু হয়। এরপর রামগোপাল রাজুবালা দেবীকে বিয়ে করেন। তিনিও কিছুদিন পর মারা যান।

এরপর আর বিয়ে করেননি। সম্ভবত তাঁদের কোনো সন্তানও ছিল না। লেখাপড়া শেষে রামগোপাল স্কুলের শিক্ষকতা দিয়ে পেশাজীবন শুরু করেন। সেই সাথে মফস্বল সাংবাদিকতা দিয়ে সাংবাদিকতা শুরু করেন। তিনি কৃষ্ণনগরের এ ভি হাই ইংলিশ স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে শিক্ষকতা শুরু করেন। বিখ্যাত কবি ও নাট্যকার দিজেন্দ্রলাল রায় তাঁর ছাত্র ছিলেন। এ ভি হাই ইংলিশ স্কুলের পর তিনি চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া ও মোমজোয়ানি স্কুলে প্রধান শিক্ষক ছিলেন। শেষে উড়িষ্যার সম্বলপুর হাই স্কুলে যোগ দিয়ে শিক্ষকতাজীবন শেষ করেন। যৌবনে কৃষ্ণনগরে অবস্থানকালে তিনি কলকাতা থেকে প্রকাশিত কয়েকটি সংবাদপত্রে মফস্বল সংবাদদাতা হিসেবে কাজ করে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। ১৮৮৩ সালের ৪মে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর অবিচারের প্রতিবাদে কৃষ্ণনগর শহরে তিনিই প্রথম প্রকাশ্য জনসভার আয়োজন করেছিলেন। বৃত্তি পরিবর্তনের অল্প দিনের মধ্যেই ১৮৯০ সাল বা তার কিছু আগে কলকাতার তালতলা অঞ্চলে একটি বাড়ি কিনে স্থায়ীভাবে কলকাতায় বসবাস এবং সেই সঙ্গে

সম্পূর্ণভাবে সাংবাদিকতার বৃত্তি অবলম্বন করেন। প্রথম কয়েকবছর তিনি বেঙ্গলি পত্রিকার কর্মাধ্যক্ষ হিসেবে কাজ করেন। তারপর ‘ইন্ডিয়ান মিরর’ পত্রিকার সহকারী সম্পাদক পদে যোগদান করেন। এই পত্রিকার সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল এক দশক বা তারও বেশি। ১৯২১ সালে রামগোপাল সান্যাল মারা যান।

বাংলা ও ইংরেজিতে লেখা রামগোপাল সান্যালের ছয়টি বইয়ের বিষয়ে খোঁজ পাওয়া যায়। এগুলো হলো- বাংলায়: ১. হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনী (১৮৮৭), ২. বাবু কৃষ্ণদাস পালের জীবনী (১৮৯০)। ইংরেজিতে:১. দ্য লাইফ অব দ্য অনারেবল ক্রিস্টোদাস পাল বাহাদুর সি.আই.ই (১৮৮৬), ২. হিস্টোরি অব দ্য সেলিব্রেটেড ক্রিমিনাল কেসেস অ্যান্ড রিজল্যুশন্স রেকর্ডেড দেয়ার অন বাই বোথ প্রভিন্সিয়াল সুপ্রিম গভর্নমেন্টস (১৮৮৮), ৩. আ জেনারেল বায়োগ্রাফি অব বেঙ্গল সেলিব্রেটিস বোথ লিভিং অ্যান্ড ডেড (১৮৮৮) ও ৪. রেমিনিসেন্স অ্যান্ড অ্যানিকডট অব আ গ্রেট ম্যান অব ইন্ডিয়া (দুই খণ্ড Ñ ১৮৯৪, ১৮৯৫)। এসবই প্রধানত জীবনীগ্রন্থ।

এর মধ্যে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনী নিয়ে বাংলায় প্রথম লেখা কোনো বই। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮২৪-১৮৬১) ছিলেন ‘হিন্দু প্যাটিয়ট’ পত্রিকার সম্পাদক। এই পত্রিকার মাধ্যমে তিনি নীলকরদের অত্যাচারের কথা তুলে ধরেন। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বলা হয় ভারতীয় সাংবাদিকতার জনক।

লেখক: কবি ও সিনিয়র সাংবাদিক, ঢাকা।

স্বাস্থ্যখাতে দুর্নীতিতে রয়েছে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ও সাংবাদিক মনির হায়দার বলেছেন, “স্বাস্থ্যখাতে দুর্নীতির পেছনে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা রয়েছে, যার ফলে এ দুর্নীতি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে।”
তিনি বলেন, “দেশে দীর্ঘদিন ধরে গণতন্ত্র না থাকায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতির কারণে দুর্নীতি বেড়েছে।”

আজ শুক্রবার (১৮ এপ্রিল) দুপুরে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

বক্তব্যে তিনি আরও বলেন, “খুব বেশি দুর্নীতি ও অনিয়ম রয়েছে এমন কয়েকটি খাতের মধ্যে স্বাস্থ্যখাত অন্যতম। শুধু স্বাস্থ্যখাতের ব্যবস্থাপনার দোষ নয়, বরং রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার কারণেই বিষয়টি অনেক দূর গড়িয়েছে।”

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, “আপনারা সরকারি পদে দায়িত্ব পালন করছেন যাকে বলে পাবলিক অফিস। এই পাবলিক অফিসে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করাই গণতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য।”

তিনি আরও বলেন, “দীর্ঘদিন দেশে গণতন্ত্র ছিল না। গণতন্ত্র না থাকার ফলে সমাজে সবচেয়ে বেশি ঘাটতি দেখা দিয়েছে দুটি জিনিসে, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা। এটা হয়তো রাজনৈতিক বক্তব্য মনে হতে পারে, কিন্তু এটি আসলে রাজনৈতিক নয়।”

“আমরা গণতন্ত্র বলতে বুঝি কেবল একটি নির্বাচন, কিন্তু সভ্য সমাজে গণতন্ত্র মানে শুধু নির্বাচন নয়। নির্বাচন হচ্ছে গণতন্ত্রে প্রবেশের দরজা। প্রকৃত গণতন্ত্রের ভিত্তি হলো স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা। এই দুটি ছাড়া কোনো আধুনিক সমাজ টিকে থাকতে পারে না,” যোগ করেন মনির হায়দার।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ। বিশেষ অতিথি ছিলেন মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. সাহারিয়া শায়লা জাহান।
এতে মেহেরপুর জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অংশগ্রহণ করেন।

“নিরবিচ্ছিন্ন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও নিরাপদ কর্মস্থল তৈরিতে করণীয়” বিষয়ক এই মতবিনিময় সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।

উল্লেখ্য, ১ দিনের সরকারি সফরে সড়ক পথে আজ সকালে তিনি নিজ জেলা মেহেরপুরে আসেন।